# দাওয়াহ ইলাল্লাহ ফোরামের নির্বাচিত পোস্ট সমগ্র

২০১৭ ঈসায়ী

# জীবনী আর্কাইভ-২০১৭

## দাওয়াহ ইলাল্লাহ ফোরামের

## নির্বাচিত পোস্ট সমগ্র

## ২০১৭ ঈসায়ী

# সূচীপত্র

কেনো আমরা সিরাহ পড়ব? ..... ৪

খুবই মজার ঘটনা, পড়বেন কি?? ..... ৮

কাফের মানসুর হাল্লাজের গোমর ফাঁক ..... ১৪

মরু সিংহ ওমর মুখতার ও একদল শকুন ..... ২০

সুলতান-সালাহুদ্দিন-আইয়্যুবী রহঃ-এর ইন্তেকাল ..... ২৫

আল কায়েদা ভারতীয় উপমহাদেশের আমির মাওলানা আসেম ওমর (হাফি.)এর সংক্ষিপ্ত জীবনি ..... ২৮

# কেনো আমরা সিরাহ পড়ব?

topu ahmed

Senior Member

০৪-১২-২০১৭

[কিছু প্রাইমারি লেভেলের ভাইদের সাথে সিরাহ নিয়ে আলোচোনা করতে চাচ্ছিলাম। যার জন্য একটা খসরা প্রস্তুত করেছিলাম। এখানে আসলে আমি যাস্ট কিছু কি ওয়ার্ড লিখেছি যাতে এর উপর ভিত্তি করে আলোচোনা করা যায়। এখানে আরো অনেক বিস্তারিত আরো টপিক আনা যেত আমি বিষেশ কারনে আনি নি। এটা করার পর ভাবলাম ভাইদের সাথে শেয়ার করা যায় ।যাতে কোন ভুল ত্রুটি থাকলে সংশোধন করা যায় কিংবা কোন ভায়ের উপকারে আসে। যাযাকাল্লাহু খাইরান।]

কেনো আমরা সিরাহ সম্পর্কে পড়াশনা করব?

সংজ্ঞাঃ সিরাহ শব্দের আবিধানিক অর্থ পথ বা রাস্তা। আরবি সাইর শব্দের অর্থ হচ্ছে হাটা। যখন কেও এক জায়গা থেকে হেটে কোন জায়গায় যায় বলে হয় সাইরুন ফুলান, অর্থত ওমুক হাঁটছে।

আরো সহজ ভাবে বলতে গেলে সিরাহ বলতে বোঝায় জীবন ও কর্ম। সিরাহ শব্দ টা দ্বারা যে কারো জীবন কর্ম বোঝানো যেতে পারে। তবে সিরাহ শব্দ টা রাসুল (স) এর ক্ষেত্তে বেশী ব্যাবহার হয় দেখে সিরাহ বলতে রাসুল (স) এর জীবনী সামনে আসে।

কেনো পড়ব?

১/ইসলামের ইতিহাস সঠিক ভাবে জানা; রাসুল (স) কে ঘিরেই ইসলামের ইতিহাস। তিনি এ দ্বীনের ভিত্তি ।কাজেই ইসলাম কে সঠিক ভাবে জানতে উপলবদ্ধি করতে সিরাহের বিকল্প নেই।

সাহাবাদের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাবো তারা পরবর্তী প্রজন্ম কে সিরাহ খুবি গুরুত্ব সহকারে অধ্যায়ন করাতেন।

সাদ ইবকে আবি ওয়াক্কাস (রা) এর পুত্র মুহাম্মদ বিন সাদ বিন আবিওয়াক্কাস বলেন, তার পিতা যখন তাদের রাসুল (স) এর যুদ্ধের ইতিহাস খুব জোর দিয়ে পরাতেন। বলতেন এগুলা তোমাদের বাপ দাদাদের ইতিহাস। তারা রাসুল (স) এর জীবনিকে মাগাজি বলতেন।

আলী ইবেন আবি তালিবের নাতী আলি আলী বি হুসাইন ইবন আলী বিন আনি তালিব বলেছেন ,আমাদের কোরানের যেভাবে পড়ানো হতো সিরাহ একই ভাবে পড়ানো হতো।

সুতরাং আমরা বুঝতে পারছি। এই দ্বীনের ইতিহাসকে সঠিক ভাবে বুঝতে হলে সিরাহ অধ্যায়নের বিকল্প নেই।

২/ রাসুল (স) এর প্রতি ভালোবাসাঃ রাসুল (স) কে ভালোবাসা মুমিন হবার শর্ত। উমার এর হাদিস।

আল্লাহ্*র সুবহানু তায়লা কোরয়ানে বলেছেন,

**قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَ أَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ**

বল, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই তোমাদের পত্নী, তোমাদের গোত্র তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর এবং তোমাদের বাসস্থান-যা কে তোমরা পছন্দ কর-আল্লাহ, তাঁর রসূল ও তাঁর রাহে জেহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা কর, আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত, আর আল্লাহ ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না। [ সুরা তাওবা ]

কাজেই আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি মুমিন হবার জন্য শর্ত হচ্ছে আল্লাহ্*র রসুল (স) ভালোবাসা।

আর ভালোবাসা তখনি যাবে যখন তার ব্যাপারে জানব। আর রাসুল (স) হচ্ছে এমন একজন ব্যক্তি যার ব্যাপারে যত জানা যাবে ততই ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে । আমর ইবেন আসের কথাই ধরুন না। তিনি তার মৃত্যু সহ্যায় কেদে কেদে বলছিলেন। আমার জোবনের তিনটি অধ্যায় আছে। প্রথমে রাসুল (স) ছিল আমার কাছে সব থেকে ঘৃনীত ব্যক্তি। তারপর আল্লাহ সুবহানু তায়লা আমার অন্তরে তার প্রতি ভালো বাসা সৃষ্টি করে দিলেন। সে হয়ে গেলো আমার কাছে সব থেকে প্রিয় ব্যক্তি।

আল্লাহু আকবর, চিন্তা করে দেখুন তিনি যখন রাসুল (স) এর কাছে গেলেন তার ব্যাপারে জানলেন তখন তিনি তার কাছে সব থেকে প্রিয় ব্যক্তি হলেন।

এমন অনেক ঘটনাই সিরাহ তে পাওয়া যায় যেখানে কন সাহাবি তার ব্যাপারে কুরাঈশ থেকে ভুল জানতেন কিন্তু যখন তারা আল্লাহ্*র (স) এর সহোবোতে

৩/তিনি আমাদের জন্য উত্তম আদর্শঃ আল্লাহ সুবহানু তায়লা পবিত্র কোরয়ানে বলেন ,

অর্থ : 'নিশ্চয়ই মুহাম্মদ সা.-এর জীবনে রয়েছে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ।' (সূরা আহজাব : ৩৩/২১)।

সুবাহান'আল্লাহ কতই উত্তম আমাদের আদর্শ। অথচ আজ আমাদের যুবকেরা আদর্শ খুজতে কথিত খেলোয়ার আর নায়ক কিংবা গায়কের মাঝে। তারা তাদের প্রিয় তারকার হেয়ার কাটিং থেকে দাড়ির ঈস্টাইল নকল করছে। এর একটা কারন বলা যায় মিডিয়া তাদের সামনে যেভাবে এইসব লোকদের তুলে ধরছে সেই ভাবে আমরা রাসুল (স) কে তুলে ধরতে পারছিনা। রাসুল (স) জীবনের আদর্শ, তার সুন্নাহ আমরা ভাইদের সামনে যেভাবে তুলা ধরা উচিত সেভাবে তুলে ধরছি না। এটা খুবই কস্টের ব্যাপারে বাংল ভাষায় কন সিরাহ এর অডিও নেই। কাজেই আমাদের উচিত হবে সমাজের এই দিক গুলোকে বদলানোর চেষ্টা করা। তাদের সামনে রাসুল (স) সুন্নাহকে সুন্দর ভাবে উপস্থাপন করা। আর এই জন্য আমাদের উচিত সিরাহ এর উপর অধিক পড়াশনা যাতে করে আমরা আমাদের আশেপাশের মানুষের সামনে ব্যাপ্র গুলা তুলে ধরতে পারি। ইনশা আল্লাহ

৪/কুরআন কে অনুধাবনঃ আম্মাজান আয়েশা (রা) কে রাসুল (স) এর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেছিলেন তোমরা কি কুরয়ান পড়া না?

হ্যা রাসুল (স) ছিলেন কুরইয়ান এর প্যাকটিকাল উদাহারন। আল্লাহ সুবহানু তায়লা তার রাসুল (স) কে দিয়ে তার বানীকে বাস্তবে রুপান্তরিত করে আমাদের জন্য মেসাল হিসেবে দেখিয়ে দিয়েছেন। আমরা কিভাবে কোন ইবাদাত করব? রাসুল (স) কিভাবে আয়াতের ব্যাক্ষা বুঝছেন। কিভাবে ইবাদাত করেছেন, কোন পদ্ধতি গ্রহন করেছেন । আমাদের সেই ভাবেই সেই গুলা করা লাগবে।

এছাড়া কোরানের অনেক আয়াত আছে যা বিভিন্ন পেক্ষাপটে নাজিল। সেই পেক্ষাপট না জানলে কোরয়ান কে অনুধাবন সম্ভন না। সেটা করতে হলে রাসুল (স) জীবনি পড়া লাগবে। উদাহারন স্বরুপ বলা যায়ঃ

সুরা আহযাবের আহযবের আয়াত বেশির ভাগ আয়াত খন্দক যুদ্ধের পেক্ষাপটে, যা জানলে আয়াত গুলা বুঝা যাবে না।

৫/ সিরাহ আলাদা একটা ইবাদাহঃ সিরাহ অধ্যায়ন আসলে আলাদা একটা ইবাদাত। আল্লাহ সুবহানু তায়লা বলছেনঃ

"হে নবী! আপনি মুসলমানদের বলুন: যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তবে আমার অনুসরণ কর। তাহলে আল্লাহও তোমাদেরকে ভালবাসবেন ও তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াময়।" (৩:৩১)

"আপনি বলুন: আল্লাহ ও রাসুলের আনুগত্য করো, যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় (অর্থাৎ আনুগত্য না করে) তাহলে তাদের জানিয়ে দিন আল্লাহ অবিশ্বাসীদের ভালবাসেন না।" (৩:৩২)

রাসুল (স) এর ব্যাপারে জানা আলাদা একতা ইবাদাত। তার সুন্নাকে অনুসরণ করা আমাদের জন্য ইবাদাত। কাজেই তার ব্যাপারে না জানলে আমরা এই ইবাদাত থেকে

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৬১৬৫

# খুবই মজার ঘটনা, পড়বেন কি??

hinder mujahid

Junior Member

০৪-১৪-২০১৭

তিনি একজন সাধারন মানুষ। সিরিয়ার রাজধানী দামেস্ক দিন মজুরের কাজ করে, কাজ না পেলে রাস্তার ধারে কাজের জন্য বসে থাকে। এ শহরে তার কেউ নেই। তার কোন বাড়ি ঘর নেই। তিনি দিন শেষে দামেস্কের মসজিদের সামনে আসেন। ইসলামের ইতিহাসে মহান বিজেতা বীর সালাউদ্দিন আইয়ুবী এর কবর ও দামেস্কের মসজিদের মাঝে যে দুই হাত ফাকা জায়গা ওখানেই রাত্রে চুপচাপ শোয়ে থাকেন। এমন ভবঘুরে মানুষকে কোথায় তাড়াবে? তাই মসজিদের হর্তাকর্তারা তাকে কিছুই বলে না। মসজিদের পিছনে একটি মাদ্রাসা। মাদ্রাসার চৌবাচ্চায় সবার ওযু গোছল শেষ হয়ে কিছু পানি থাকলে তিনি রাত্রে গোছল করেন।

এভাবেই তার লক্ষহীন দিন কেটে যাচ্ছিলো।

এক শীতের রাত্রে তিনি শোয়ে আছেন। চার দিকে হাড় কাঁপানো ঠান্ডা বাতাস। এমন সময় স্বপ্নদোষে তার গোছলের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলো। তিনি মসজিদের আঙ্গিনায়, তাই সকালের আশায় অপবিত্র হয়ে থাকা যাবে না। তিনি মাদ্রাসার চৌবাচ্চায় গোছল করলেন। গোছল শেষে শোয়ে ঘুমিয়ে গেলেন। কিছুক্ষন পরে আবার স্বপ্নদোষে গোছল ফরজ হলো। কনকনে শীত উপেক্ষা করে আবারো গোছল করেন। কিন্তু শীতের রাতে দুবার গোছল করার ধকল শরীর সইতে পারলো না। কাঁপতে কাঁপতে জ্ঞান হারালেন।

ফজরের সময় তার জ্ঞান ফিরে এলো। ফজরের নামাজের পর মাদ্রাসার এক শিক্ষককে তিনি রাতের সব ঘটনা বললেন। সব শোনে শিক্ষক বললেন ‘ইলম জানেন না তাই আপনাকে কষ্ট পেতে হলো। মাসআলায় বলা আছে, প্রচন্ড ঠান্ডায় শারীরিক অসুস্থতার প্রবল আশংকা দেখা দিলে ফরজ গোছলের পরিবর্তেও তায়াম্মুম করা যায়।‘

এমন সহজ মাসআলা শোনে তিনি লজ্জিত হলেন। আহা, ইসলাম কত সহজ, মায়াময়। জানিনা বলেই না জানি আর কতো কষ্ট পেতে হবে। তিনি নিয়ত করলেন আজ থেকে সব শিখবেন। তার মনের দৃঢ় বিশ্বাস তিনি আলেম হবেন। সারাদিন দিন মজুরের কাজ করে রাতে মাদ্রাসার শিক্ষকের কাছে পড়তে লাগলেন। এভাবে কেটে গেলো দীর্ঘ ১০টি বৎসর। তিনি আজ আলেম হয়েছেন। দুনিয়ার মোহ ত্যাগ করেছেন, এলমের ভান্ডার পেয়েছেন তিনি। এর শুধুই মাথা উচু করে শাসিয়ে গেছেন পরাক্রমশালী শাসকদের।

এতোদিন তিনি যে মসজিদের আঙ্গিনায় রাত কাটাতেন, কালের বিবর্তনে আল্লাহর রহমতে সিরিয়ার সেই প্রধান মসজিদের প্রধান খতীব পদে সমাসীন হলেন। সিরিয়ার বাদশা তখন ইসমাঈল। তার চাচাতো ভাই নাজমুদ্দিন আইয়ুব মিসরের বাদশা। কোন এক সাধারন বিষয় নিয়ে তাদের দুই চাচাতো ভাই এর মাঝে বিবাদ লেগে গেলো। এর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য বাদশা ইসমাইল খ্রিষ্টান ফিরিঙ্গিদের সাথে আতাত করলেন। লাজলজ্জার মাথা খেয়ে তিনি ফিরিঙ্গিদের হাতে দুটি মুসলিম এলাকা তোলে দিতে সম্মত হলেন। এর বিনিময়ে ফিরিঙ্গিরা তার চাচাতো ভাইকে শায়েস্তা করবে।

সব শোনে গর্জে উঠলেন প্রধান খতিব। শুক্রবার বাদশা ইসমাইলের উপস্থিতিতে তিনি মিম্বারে উঠলেন। খুতবায় বাদশাহর কঠোর সমালোচনা করেন। মুসলমানদের সাথে খেয়ানত করায় তাকে ভৎর্সনা করলেন। একজন খতিব রাষ্ট্রিয় ইস্যুতে বাদশার উপস্থিতিতে বাদশাকে শাসাচ্ছেন ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্মে কি এটা ভাবা যায়? এখানেই শেষ নয়। মিম্বার থেকেই তিনি ফতোয়া জারি করলেন 'যে লোক ব্যক্তি স্বার্থে মুসলিম অঞ্চল বিধর্মির হাতে তোলে দেয় তিনি মুসলিম অঞ্চলের শাসক হওয়ার অযোগ্য।' ফতোয়া মোতাবেক তিনি ইসমাইলকে পদচ্যুত ঘোষনা দিলেন।

নামাজ শেষে বাদশা খতিব সাহেবকে গৃহবন্ধি করলেন। খবরটি বাতাসের আগে সিরিয়ায় সরিয়ে পরলো। রাজ্যজুড়ে তোলপার শুরু হলো। মানুষ সব রাস্তায় নেমে বাদশা ইসমাইলকে কার্যত অবরোধ করে ফেললেন। বাদশা নিরুপায় হয়ে বললেন 'শায়খ যদি আমার হাতে চুমো দেন, তবে তাকে স্বসম্মানে মুক্তি দিবো।' তৎকালীন সময়ে হাতে চুমো দেওয়ার অর্থ ছিলো, তার শাসন মেনে নেওয়া। প্রতিনিধি দল

গেলেন শায়খের কাছে। কয়েকবছর আগেও যে সিরিয়ার পথে পথে ঘুরতেন, দিনমজুর ছারা যার আর কোন নাম ছিলো না, আজ তার কাছে রাষ্ট্রিয় সন্ধির প্রস্তাব। তাকে নিয়ে গোটা সিরিয়ায় উৎকণ্ঠা। সন্ধির কথা শোনে তিনি সাফ জানিয়ে দিলেন "তোমাদের মালিককে বলে দাও, তার হাতে চুমো খাওয়াতো দূরের কথা, তিনি এসে আমার হাতে চুম্বন করতে চাইলেও অনুমতি দিবো না। যাও, চলে যাও।"

বাদশা রেগে এবার শায়খকে তার নিজের ঘরের পাশের ঘরে বন্ধি করে রাখলেন। শায়খ কোরআন পড়তেন পাশের রুম থেকে বাদশা শোনতেন। এমতাবস্থায় একদিন ফিরিঙ্গিরা এলো বাদশাহর সাথে পরামর্শ করতে। বাদশা বললেন 'পাশের ঘর থেকে যার কোরআন পড়ার আওয়াজ পাচ্ছেন আপনাদের দুটি অঞ্চল দেওয়ায় তিনি আমার প্রতি ক্ষুব্ধ। তোমাদের সাথে আপষের সংবাদ শোনে তিনি আমাকে অযোগ্য শাসক ঘোষণা করেছেন, এজন্য তাকে আটকে রেখেছি।"

ফিরিঙ্গি প্রধান বললেন 'তার সম্পর্কে সব শোনেছি। এ মানুষটি যদি আমাদের এলাকার ও আমাদের ধর্মের হতো, তবে এমন একজন নির্মোহ জ্ঞানীর পা ধুয়ে আওয় পানি টুকু পান করতাম সৌভাগ্য মনে করে।" বিধর্মীরা সত্য অনুধাবন করেছিলেন কিন্তু মুসলমান হয়েও ব্যক্তিস্বার্থের মোহে অন্ধ হয়ে বাদশা ইসমাইল বোঝার শক্তি থেকে বঞ্চিত ছিলেন। অবশেষে জনগণের আন্দোলন ও অব্যাহত চাপ সহ্য করতে না পেরে বাদশা ইসমাইল তাকে স্বসম্মানে মুক্তি দিলেন। কিন্তু ততদিনে তিনি মনস্থির করে ফেলেছেন তিরি সিরিয়া থাকবেন না। কারন সিরিয়ার শাসক মুসলিমদের সাথে খেয়ানতকারী। তার সাহচার্য নিরাপদ নয়। এমন বাদশাহদের নিকট থেকে দূরে থাকাই শ্রেয়।

৬৩৯ হিজরীতে তিনি সিরিয়া ছেড়ে মিসরে চলে গেলেন। মিশরের বাদশা নাজমুদ্দীন আইয়ুব মহান এ লোকের আগমনে খুশি হয়ে তাকে স্বাগত জানালো। মিশরের বাদশা এ শায়খকে মিশরের প্রধান খতীব, প্রধান বিচারপতি সহ আরো অনেক গুরুত্বপূর্ন পদ হাতে তুলে দিলেন। মিসরবাসিও এমন নির্ভিক আলেম ও শায়খকে পেয়ে খুশি।

বাদশার এতো সমাধর আর দেশবাসীর ভালোবাসা পেয়েও নিজের দ্বায়িত্ব ও কর্তব্যে বিন্দু মাত্র ছাড় দিতে নারাজ এ শায়খ। শাসন ক্ষমতায় বসে কেউ নিজের

আখের গোচাচ্ছে কিনা, যে যেই পদে আসিন সে সেই পদের উপযুক্ত কিনা প্রধান বিচারপতি হিসেবে তিনি তাঁর খোজ খবর নিতে লাগলেন। কাউকেই তিনি বিন্দু মাত্র ছাড় দেন নি। প্রমাণ হিসেবে একটি ঘটনা বর্ণনা করতেছি।

মন্ত্রী উজিরদের সম্পর্কে তদন্ত করে দেখতে পেলেন ক্ষমতাসীন নায়েবে সুলতান যা দেশের ২য় সর্বোচ্চ পদ, সে সহ অনেক মন্ত্রী ও উজির একসময় গোলাম ছিলো কিন্তু তারা আজাদ হয়নি। ইসলামের হুকুম আহকাম গোলাম ও মনিবের জন্য সমান নয়। ইসলামের কিছু বিধান আছে, যেগুলি পালন করতে পূর্ন স্বাধীন হতে হয়। আর যারা শাসন ক্ষমতায়, তাদের স্বাধীন হওয়াতো অপরিহার্য। তাই তিনি স্বপ্রণোদিত হয়ে তার হাইকোর্ট থেকে রুল জারী করলেন "শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত যাদের গোলামী আজাদ করা হয়নি, রাষ্ট্রিয়ভাবে তাদেরকে পুনরায় বিক্রী করা হবে। তারা শরিয়ত মোতাবেক পুনরায় আজাদী লাভ করলে ক্ষমতায় পুনঃবহাল করা হবে। নয়তো এদের হাতে শাসনসম্পর্কিত সমস্ত বিধি-বিধানের চুক্তি ও ক্ষমতা চর্চা অবৈধ বলে গণ্য করা হবে।"

ভিন দেশ থেকে আসা এক আলেম নায়েবে সুলতান সহ অনেক মন্ত্রী ও আমলাকে বিক্রির আদেশ দিয়েছেন এমন রুল শোনে সারা মিসর অবাক ও কৌতুহলি হয়ে উঠলো। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন সাহসি ঘটনা এটাই প্রথম, এটাই শেষ।

শায়খের এমন রুলের কথা শোনতে পেয়ে ছুটে এলেন শাসক নাজমুদ্দীন আইয়ুব। হাত জোর করে বললেন 'এ হুকুম বদলে দিন, অন্য কোন উপায় বলুন।'

শায়খ বললেন 'শরিয়তের বিধান পাল্টানোর ক্ষমতা কারো নেই। গোলাম কক্ষনো স্বাধীন লোকের শাসক হতে পারে না। শাসক হতে হলে তাদের আযাদ হতে হবে।

শায়খের হুকুম শুনে মন্ত্রী আমলারা বিরোধিতা শুরু করলো। তারা কেউ এ রুল মানবে না। শায়খের কানে এ খবর আসা মাত্র তিনি বাদশার নিকট ইস্তফা পত্র পাঠিয়ে দিলেন। তাতে লিখা, "তিনি নিজের জন্য কোন রুল জারি করেননি বা নিজের মতকে রুল হিসেবে জারি করেননি। এটা ইসলামের শরিয়ত। ইসলামের শরিয়তকে প্রধান বিচারপতি রুল হিসেবে জারি করার পর যদি মন্ত্রী আমলারা সেটা না মানে তবে এমন বিচারপতি হওয়ার দরকার নেই। কাজেই এ রুলকে আইন না করার যদি কোন ইচ্ছা না থাকে তবে আমার পদ নিয়ে নিন।"

বাদশাকে ইস্তফাপত্র দিয়ে তিনি মিসর থেকে চলে যাবার জন্য রওনা দিলেন। খবর ছড়িয়ে পরলো সারা মিসরে, শায়খ মিসর ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। শায়খের মিসর ত্যাগের খবর শোনে মিসরের ছাত্র, শিক্ষক, আলেম, ব্যবসায়ি, সমাজপতিদের অধিকাংশ ও মিসরের সাধারন জনগণ শায়খের পিছে ছুটলেন। সমস্ত মিসরবাসি শায়খের সাথে মিসর ত্যাগ করবে। যে দেশের শাসকরা শায়খের কদর বুঝে না, ঐ দেশে তারা থাকবে না।

বাদশার চোখে তখন অন্ধকার নেমে আসলো। প্রজাই যদি না থাকে রাজা কাকে নিয়ে রাজ্য চালাবেন? শায়খের জনসমর্থন দেখে উপদেষ্টাদের পরামর্শে বাদশা চললেন শায়খকে আটকাতে। দ্রুত গতির ঘোড়া নিয়ে অল্প সময়েই শায়খের নাগাল পেলেন। বিচারপতির রুলকে আইন করে তা বাস্তবায়ন করা হবে এমন প্রতুশ্রুতি দিয়ে শায়খ ও মিসরের জনগনকে মিসরে ফিরিয়ে আনলেন।

কয়েকদিন পর বিশাল আয়েজন করে মন্ত্রী আমলাদের বিক্রির ব্যবস্থা করা হলো। লোকজন বাইতুল মালে টাকা দিয়ে মন্ত্রী আমলাদের কিনে নিলেন। তারপর তাদের মনিব তাদের আজাদ করার পরেই তাদের আগের পদ পদবী ফিরিয়ে দেওয়া হয়। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন ঘটনা আর ২য়টি হয়নি। মুসলিম ইতিহাসে এমন ঘটনা একটিই। রাজা ও উজিরদের ওপর ছড়ি ঘোরানোর মত অসীম সাহসী এমন একজন আলেম একবারই এসেছিলো ইতিহাসের কোলে। এ ঘটনার পর তার উপাধি হয় 'আমীরদের বিক্রেতা'।

তিনি ৬৬০ হিজরীর ১০ জুমাদাল উলা, ১২৬১ সালে সালে ৮৩ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর গোটা মিসর সিরিয়া ও আশেপাশের এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে, সবাই শোকার্ত হয়ে জানাজায় অংশ নেন। জানাজার শুরুর আগে মিসেরের বাদশা নাজমুদ্দিন একটি পাহাড়ে উঠলেন। কিন্তু না, ডানে বামে কোথাও যেন মানুষের শেষ নেই। দৃষ্টি সীমা ছাড়িয়েও মানুষ আর মানুষ তার জানাজায় অংশ নিয়েছিলেন। নাজমুদ্দিন পাশে দাড়ানো উজিরকে বললেন 'আজ মিসরকে আমার শাসিত মনে হচ্ছে। এ মানুষটি যতদিন বেচে ছিলো ততদিন আমি মিসরের নামে মাত্র শাসক ছিলাম।

আজ আর এমন কেউ নেই যার সামান্য ইশারায় মিসর কেপে উঠবে। এ বিষয়ে আমি আপাতত নিরাপদ।" তুমুল জনপ্রিয়তার অধিকারী, শাসকদের অন্যায়ের

সাথে আপষহীন, নির্মোহ নির্ভিক এ শায়খের নাম “ইযযুদ্দীন ইবনে আব্দুস সালাম“। তিনি একজন বিচারক ও প্রধান খতীব ছাড়াও একাধারে তাফসীর, হাদীস, সীরাত, আকিদা, ফিকহ এবং উসূলে ফিকহ শাস্ত্রে গুরুত্বপূর্ণ রচনাবলী লিখে গেছেন। কি ছিলেন তিনি আর এলম ও তাকওয়ার জন্য কোথায় এসে পৌঁছেছেন!

সংগৃহীত।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৬২২৯

# কাফের মানসুর হাল্লাজের গোমর ফাঁক

abdollah bin tamer

Junior Member

০৪-০৯-২০১৭

মানসুর হাল্লাজের গোমর ফাক,,,,,,,,,,,,,, রূপকথার ওলী (না পড়লে বিভ্রান্ত হতে পারেন)

#মানসুর_হাল্লাজ

**نعوذ بالله أن نقول عليه ما لم يكن قاله أو نتحمل عليه في أقواله و أفعاله**
শুরুতেই আমরা আল্লাহ তায়ালার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি' কারো বিরুদ্ধে এমন মতবাদ বা এমন কাজের কথা বলতে যা তার মধ্যে নেই বা আদৌ সে করেনি।
নাম : হুসাইন ইবনে মানসুর ইবনে মাহমী আল-হাল্লাজ আবু মুগীস এবং তাকে আব্দুল্লাহ ও বলা হত। তার দাদা ছিল অগ্নি পূজক। তার (দাদার) নাম ছিল মাহমী। সে ছিল পারস্যের বাইযা শহরের অধিবাসী।

মানসুর হাল্লাজ সম্পর্কে রূপকথায় মত সমাজে অসংখ কল্পকাহিনী প্রচলিত ।

তাকে সাধারণ মুসলমানদের কেউ ইতিবাচ, কেউ নেতিবাচক হিসেবে গ্রহণ করছে।এতে করে সর্ব সাধারণের ঈমান-আকীদায় বিরাট প্রভাব ফেলছে ।

ইসলামের ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ ইবনে কাসীর (রহ.) প্রণীত “আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া” , খতীব বাগদাদী (রহ.) এর লিখিত 'তারিখে বাগদাদ', ইবনুল জাওজী (রহ.) -এর 'আল মুন্তাজেম' ও ইমাম আয যাহাবী (রহ.) -এর 'সিয়ারু আ'লামিন নুবালা' ইত্যাদি নির্ভরযোগ্য গ্রন্থে হাল্লাজের আকীদা-বিশ্বাস ও কর্মজীবনের উপর বিশদ বিবরণ এসেছে।

সেগুলো চুম্বকাংশ তুলে ধরা হচ্ছে-

মানসুর হাল্লাজ ২৪৪ হি./৮৫৮ খ্রি. জন্ম গ্রহণ করে। তার দাদা পারস্যের অধিবাসী ও একজন অগ্নি উপাসক ছিল। সে ইরাকের ওয়াসেত শহরে জীবনের একটি অংশ অতিবাহিত করার পর বাগদাদে গমন করে । হজ্জ পালনের জন্য

কয়েকবার মক্কায়ও গমন করে । এমনকি বিশুদ্ধ সূত্রে প্রমাণিত, সে যাদু বিদ্যার্জনের লক্ষ্যে ভারতেও আসে ।

যাদু প্রসঙ্গে সে বলত- **أدعو به الى الله** –আমি যাদুর মাধ্যমে লোকদেরকে আল্লাহ্*র দিকে দাওয়াত দিই । ("আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া")

আল্লামা ইবনুল কাইয়ূম আল জাওযী বলেন,

-লোকদের ধোঁকা দেয়ার জন্য বহু কৌশল তার আয়ত্তে ছিল। বেশভূষা পরিবর্তন করে এক শহর থেকে অন্য শহরে ঘুরে বেড়াত। মানুষ তার ব্যাপারে দ্বিধাদ্বন্দ্বে বিভক্ত ছিল। সে Pantheism (সর্বেশ্বরবাদ) ও Zoroastrianism (জরাথ্রুস্ট প্রবর্তিত ও জেনদ্-আবেস্তায় বর্ণিত প্রাচীন পারস্যবাসীর অগ্নি উপাসনার ধর্ম) ইত্যাদি দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল । সে সূফীবাদী দর্শন হুলুল ( আল্লাহ্* তায়ালা কোন ব্যক্তি বিশেষের মাঝে প্রবিষ্ট হওয়া ) ও 'ওয়াহদাতুল ওজুদ' ( স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝে কোন পার্থক্য নেই, স্রষ্টার আলাদা কোন অস্তিত্ব নেই, সকল সৃষ্টির মাঝে তাঁর অস্তিত্ব বিরাজমান ) এর অন্যতম প্রবক্তা । ওয়াহদাতুল ওজুদ তথা একক অস্তিত্ব এই দর্শনে প্রভাবিত হয়ে সে বলত- **ما في جبتي الا الله**.- আমার জুব্বার মাঝে যে স্বত্বা রয়েছে তা আল্লাহ্* ছাড়া অন্য কেউ না । **أنا الحق** - আমি আল্লাহ্* ইত্যাদি ।

হাল্লাজের কবিতা সংকলন **ديوان الحلاج** - বইয়ে সে মানুষকে সম্বোধন করে হাল্লাজ বলছে:

—তুমি আমাকে দেখার অর্থ তাঁকে (আল্লাহ্*) দেখা

আর তাঁকে (আল্লাহ্*) দেখার অর্থ আমাকে দেখা ।

আল্লাহকে সম্বোধন করে বলছে

—নিঃসন্দেহে আমি হচ্ছি তুমি (আল্লাহ্*)

তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করা আমারই পবিত্রতা ঘোষণা করা । তোমার তাওহীদ ঘোষণা করা আমারই তাওহীদ ঘোষণা করা ।

তোমার নাফরমানী করা আমারই নাফরমানী করা ।

আমি তোমার দ্বীনের সাথে কুফরী করেছি, কারণ কুফরী আমার জন্য ওয়াজিব হয়েছে। যদিও মুসলিমদের নিকটে তা নিন্দনীয়।

তোমার আত্মা আমার আত্মার সাথে মিশে গেছে যেরূপে মদ সুপেয় পানির সাথে মিশে যায়।

তোমাকে কিছু স্পর্শ করলে তা আমাকে স্পর্শ করে,কারণ সর্বাবস্থায় আমিই তো তুমি।

ইত্যাদি।
আরো আছে-

**جبلت روحك في روحي كما ... يجبل العنبر بالمسك الفنق ... فإذا مسك شيء مسني ... وإذا أنت أنا لا نفترق**

১. তোমার রুহ আমার রুহে এমন ভাবে প্রবেশ করেছে, যেমনিভাবে মৃগনাভীর সাথে কোমল পানির মিশ্রণ হয়।

সুতরাং যখন কোন জিনিস তোমাকে স্পর্শ করে তা যেন আমাকেই স্পর্শ করে। অতএব তুমিই আমি, আমাদের মাঝে কোন পৃথকতা নেই।

**وقوله ... مزجت روحك في روحي كما ... تمزج الخمرة بالماء الزلال ... فإذا مسك شيء مسني ... فإذا أنت أنا في كل حال**

২. তোমার রুহ আমার রুহের সাথে এমন ভাবে মিশ্রণ ঘটেছে যেভাবে পানির মিশ্রণ ঘটে রঙ্গের সাথে। সুতরাং যখন কোন জিনিস তোমাকে স্পর্শ করে তা যেন আমাকেই স্পর্শ করে। অতএব সর্ব অবস্থায় তুমিই আমি, এবং আমিই তুমি।

**وقوله أيضا ... قد تحققتك في سر... ي فخاطبك لساني ... فاجتمعنا لمعان ... و افترقنا لمعان ... إن يكن غيبتك التعظي ... م عن لحظ العيان ... فلقد صيرك الوجد من الأحشاء دان**

৩. নিঃসন্দেহে আমিই তুমি , সুতরাং তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করা মানেই হচ্ছে আমার পবিত্রতা ঘোষণা করা। এবং তোমার একাত্ব মানেই হচ্ছে আমার একাত্ব, এবং তোমার অবাধ্যতা মানেই হচ্ছে আমার অবাধ্যতা।

হযরত আব্দুর রহমান আস সুলামী আমর বিন উসমানের সূত্রে বর্ণনা করেন, আমর বলেন,

-হজ্জের মৌসুমে আমি একদা হাল্লাজের সাথে মক্কার কোন এক গলিতে হাঁটছিলাম আর কোরআন তেলাওয়াত করছিলাম। হাল্লাজ আমার তেলাওয়াত শুনে বলল, 'আমার পক্ষেও এই ধরণের কথা (আয়াত) বলা (বানানো) সম্ভব। এমন কথা তার মুখ শুনে তাৎক্ষণিক আমি তার সঙ্গ ত্যাগ করি।

সে কারণে প্রায়শ আমর বিন উসমান হাল্লাজকে লানত করতে এবং বলতেন- আমার ক্ষমতা থাকলে তাকে নিজ হাতে হত্যা করে ফেলতাম!

আবু জুর'য়া আত তাবারী বলেন, আমি আবু ইয়াকুব আল আকতা'য় কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন,

-প্রথম দিকে হাল্লাজের দরবেশির প্রতি মুগ্ধ হয়ে আমি আমার বোনকে তার সাথে বিবাহ দিই। কিছু দিন পর আমার কাছে প্রমাণিত হয় সে একজন যাদুকর, প্রতারক, খবীস ও কাফের।

আব্দুর রহমান সুলামী আমর বিন উসমানের সূত্রে বর্ণনা করেন-

আবু বকর বিন মিনশাদের নিকট এক ব্যক্তি আসল। যার সাথে একটি থলে ছিল । রাতে-দিনে কক্ষনো সে থলেটি নিজের কাছ থেকে দূরে রাখত না । লোকেরা কারণ অনুসন্ধানের জন্য থলেটি খুললে মানসুর হাল্লাজ প্রেরিত একটি চিঠি পেল । যার শিরোনাম ছিল- من الرحمن الرحيم الى فلان ابن فلان -রাহমান রাহীমের পক্ষ হতে .....। হাল্লাজ চিঠিটির সত্যতা স্বীকার করল। লোকেরা তাকে প্রশ্ন করল, তুমি কি নিজেকে আল্লাহ্* দাবী কর ? জবাবে সে বলল- না, তবে আল্লাহ্* ও আমি তো একই সত্ত্বা ।

হাল্লাজ তার খাস মুরিদদের মাধ্যমে পাহাড়ী এলাকার সহজ-সরল মূর্খ মানুষদের প্রতারিত করে হাজার হাজার স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা উপার্জন করেছে । তার মিথ্যা

কারামতির কৌশল জেনে ফেলায় একজনকে গুপ্ত ঘাতক পাঠিয়ে হত্যার হুমকিও দিয়েছে । এসব প্রতারণার কাহিনী ইবনে কাসীর আল বিদায়া ওয়ান নিহায়াতে উল্লেখ করেছেন।

শাইখুল ইসলাম আল্লাম ইবনু তাইমিয়্যাহ রহ: বলেন- 'যে আকীদা পোষণ করার কারণে হাল্লাজকে হত্যা করা হয়েছে, সেই আকীদা যদি কেউ পোষণ করে সে মুসলিমদের ঐক্যমত অনুযায়ী কাফের ও মুরতাদ। মুসলিমরা হুলুল, ওয়াহদাতুল ওজুদ ইত্যাদি আকীদা পোষণ করার কারণে তাকে হত্যা করেছে । যেমন সে বলত- "আমি আল্লাহ। আসমানে এক প্রভু আছে ও জমিনে আরেক প্রভু আছে । তার কিছু যাদুবিদ্যাতে সে বেশ পারঙ্গম ছিলো।যাদুর উপর কয়েকটি বইও লিখেছিল । (মাজমুয়ুল ফাতাওয়া)

তিনি আরও বলেন-

-আমি মুসলিমদের কোনো বিজ্ঞ আলেম ও মাশায়েখ সম্পর্কে জানিনা, যারা হাল্লাজ সম্পর্কে ভাল ধারণা রাখেন। তবে কিছু লোক হাল্লাজের আকীদা সম্পর্কে না জানার কারণে তার প্রশংসা করেছে।

বাগদাদের তখনকার সর্বশ্রেষ্ঠ আলেমগণ ও বড় বড় আওলিয়াগণ তাকে 'কাফির' বলে 'ফাতাওয়া' দিয়েছেন। যার ফলে সরকার তাকে প্রকাশ্যভাবে শূলেচড়িয়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেছেন।

(৩০৯ হিঃ/৯২২ খ্রিস্টাব্দে হাল্লাজকে মৃত্যু দণ্ড দেওয়া হয়।)

আমার বুঝে আসে না, কতিপয় পীর, ও কণ্ঠধারী বক্তারা তার কুফুরির এত এত প্রমাণাদি পরিস্কার ভাবে অদ্যাপি বিদ্যমান থাকতেও কেনো তাকে 'সূফীকুলশিরোমনি', আল্লাহরওলী' ইত্যাদি বলে থাকে!

বিশেষ করে মাওলানা নূরুল ইসলাম ওলিপুরী সাহেব হাফিজাহুল্লাহুর মত বড়দের থেকে কেনো এমন মত পাচ্ছি!

তাছাড়া, কতিপয় উর্দু বা বাংলা বইয়েও তাকে 'অলিকুল' বলা হয়েছে! মূলত, এসমস্ত বইয়ে ( যেমন : মাআরিফে মাসনুবি ইত্যাদি বইয়ে) কাল্পনিকচরিত্রের লাইলি-মজনু ও শিরি-ফরহাদের মত 'মানসুর হাল্লাজ-এর চরিত্রও রূপকথার ধাঁধানো কথা!

প্রমাণাদি-

১. মাজমুউল ফাতাওয়া (২/৪৮০ পৃ.- ৪৮৪ পৃ.)

২. 'তারিখুল বাগদাদ' লেখক : খতীবে বাগদাদী রহ: (৮/ ১১২ -১৪১)

৩. 'আল মুনতাযাম' লেখক: ইবনুল জাওযী রহ: (১৩/২০১-২০৬)

৪. 'আল বিদায়া অন নিহায়া' লেখক : ইমাম ইবনে কাসীর রহ:(১১/১৩২-১৪৪)

৫. 'সিয়ারু আ'লাম আন নুবালা' লেখক : ইমাম জাহাবি রহ: (১৪/ ৩১৩-৩৫৪)

**أ.هـ مجموع الفتاوى ( 483/2)**

**للاستزادة يراجع:**

**) تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ( 141-112/8) . المنتظم لابن الجوزي سير أعلام النبلاء للذهبي ( 14 / 354-313 ) . البداية والنهاية . (13/201-206 . (لابن كثير( 144-132/11**

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৬১০৬

# মরু সিংহ ওমর মুখতার ও একদল শকুন

ABU SALAMAH

Senior Member

০৪-২০-২০১৭

১৯৩১ সাল। লিবিয়ার বেনগাজির সামরিক আদালত। বিচারক ও শৃঙ্খলাবদ্ধ ‘আসামির কথোপকথন-

-আপনি কি ইতালির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন?

-হ্যাঁ।

-আপনি কি ইতালির বিরুদ্ধে লড়াই করতে লোকজনকে উৎসাহিত করেন?

-হ্যাঁ।

-আপনি যা করেছেন তার দণ্ড সম্পর্কে কি আপনি জানেন?

-হ্যাঁ।

-আপনি কত বছর ধরে ইতালির বিরুদ্ধে লড়াই করছেন?

-২০ বছর।

-আপনি যা করেছেন তার জন্য কি অনুশোচনা হয়?

-না।

-আপনি কি বুঝতে পারছেন আপনাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে?

-হ্যাঁ।

এ পর্যায়ে বিচারক বললেন- ‘আপনার মতো লোকের জন্য এটি করুণ পরিণতি।’ কাঠগড়ায় দাঁড়ানো মানুষটির জবাবও বেশ তীক্ষ্ম। তিনি বললেন, ‘বিপরীতভাবে বলতে পারি জীবন শেষ করার সবচেয়ে ভালো উপায় এটি।’

না, এগুলো কোনো গল্প কিংবা উপন্যাসের কল্পিত লাইন নয়। এগুলো লিবিয়ার বেনগাজিতে সামরিক আদালতের বিচারকের সঙ্গে মরু সিংহ হিসেবে পরিচিত ইতালির দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে লড়াই করা মুজাহিদদের নেতা ওমর মুখতারের কথোপকথন।

মুখতারের চূড়ান্ত প্রতিপক্ষ ছিলেন জেনারেল রডোলফো গ্রাজিয়ানি। তার বর্ণনা মতে, মুখতার ছিলেন 'মাঝারি উচ্চতার ও সুঠাম দেহের অধিকারী এবং সাদা দাড়ি গোঁফ বিশিষ্ট ব্যক্তি। ওমর মুখতার ছিলেন প্রত্যুৎপন্নমতি সম্পন্ন, ধর্মীয় বিষয়ে জ্ঞানী, শক্তিসম্পন্ন ও ক্ষিপ্র, স্বার্থ ও আপোষহীন। তিনি খুব ধার্মিক ও দরিদ্র ছিলেন, যদিও তিনি ছিলেন সেনুসিদের (আধ্যাত্মিক গোষ্ঠী) মধ্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে।'

ওমর মুখতার লিবিয়ার পূর্ব সিরনিকার আল-বুতনান জেলায় জানযুর গ্রামে ১৮৫৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবার নাম ছিল আল মুখতার ইবনে মুহাম্মাদ। আর মায়ের নাম ছিল আয়েশা বিনতে মুহারিব। শৈশবেই বাবা-মা দুজনকে হারান মুখতার। পরে তাকে দত্তক পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেন শারিফ আল গারিয়ানি নামের এক ব্যক্তি।

মুখতারের প্রাথমিক শিক্ষা শেষ হয়েছিল স্থানীয় মসজিদে । পরে তিনি সুফিদের আন্দোলন সেনুসির মূলকেন্দ্র জাগবুবের সেনুসি বিশ্ববিদ্যালয়ে আট বছর শিক্ষালাভ করেন। ১৮৯৯ সালে ফরাসিদের প্রতিহত করার জন্য রাবিহ আযযুবায়েরকে সাহায্য করতে অন্য সেনুসিদের সাথে তাকে অফ্রিকার চাদ ভুখণ্ডে পাঠানো হয়। সেখানে সেনুসি নেতা আল মাহমুদের মৃত্যুর পর ১৯০২ সালে মুখতারকে লিবিয়ায় ডেকে পাঠান সেনুসসিদের শীর্ষ নেতা আহমেদ শরীফ আস সেনুসি। তিনি মুখতারকে লিবিয়ার পূর্ব উপকূলীয় এলাকা সাইরেনাইসার উত্তরাঞ্চলের জাওইয়াত লকসর এলাকার নেতা করে পাঠান।

তুরস্কের অটোমন সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগে ১৯১১ সালে অ্যাডমিরাল লুইগি ফারাভেলির নেতৃত্বে ইতালির নৌবাহিনীর একটি দল লিবিয়ার উপকূলে পৌঁছায়। এসময় তারা ত্রিপোলি ও বেনগাজি অবরুদ্ধ করে ফেলে। তার তুর্কিদের ওই এলাকা ছেড়ে চলে যেতে বলে। কিন্তু তুর্কি ও স্থানীয় সেনারা আত্মসমর্পণের পরিবর্তে শহরের ভেতরের দিকে চলে যায়। ইতালীয়রা তিন দিন পর্যন্ত ত্রিপোলি ও বেনগাজির ওপর গোলাবর্ষণ করে। শেষ পর্যন্ত শহর দুটি ইতালির নৌবাহিনীর

দখলে চলে যায়। এই ঘটনার মধ্য দিয়ে ইতালির সেনাবাহিনী এবং ওমর মুখতারের সঙ্গে দীর্ঘ ২০ বছরব্যাপী যুদ্ধের সূচনা হয়।

পেশায় ওমর মুখতার ছিলেন কুরআন শিক্ষক। তবে মরুভূমিতে যুদ্ধ পরিচালনায় তার দক্ষতা ছিল অসাধারণ। স্থানীয় ভূপ্রকৃতি সম্পর্কে থাকা জ্ঞান তিনি ইতালির সেনাদের বিরুদ্ধে কাজে লাগান। ইতালীয়রা মরু অঞ্চলে যুদ্ধের সাথে পরিচিত ছিল না। মুখতার তার বাহিনী নিয়ে ইতালির সেনাদের ওপর গেরিলা হামলা চালাতে শুরু করেন। তার বাহিনী দক্ষতার সঙ্গে ইতালি সেনাদের চৌকির ওপর হামলা চালিয়ে সরে পড়তো। তারা ইতালির সেনাদের যোগাযোগ ও রশদ সরবরাহে ব্যাপকভাবে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়।

পরপর কয়েকজন কর্মকর্তার ব্যর্থতার পরিপ্রেক্ষিতে ইতালির শাসক মুসোলিনি তার সেনা কর্মকর্তা জেনারেল গ্রাজিয়ানিকে লিবিয়ায় ইতালীয় সেনাবাহিনীর প্রধান হিসাবে নির্বাচন করেন। গ্রাজিয়ানি দাবি করেছিলেন, লিবিয়াকে পুরোপুরি ইতালির নিয়ন্ত্রণে আনতে চাইলে তাকে আইনের বালাই না রেখে যে কোনো পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষমতা দিতে হবে, এর জন্য তার কাছে কোন জবাবদিহি চাওয়া যাবে না। মুসোলিনি তা মেনে নেন।

স্থানীয়রা যাতে মুজাহিদিনদের সহযোগিতা করতে না পারে সেজন্য গ্রাজিয়ানি হাজার হাজার লিবীয়কে ইতালির সেনাদের নিয়ন্ত্রণে থাকা কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে থাকতে বাধ্য করেন। যে সব লিবীয় আল-জাবাল আল আকদার, মোরতাফ আত আল তাহির, বিনিনা উত্তর থেকে আশ শালাইতিমিয়া দক্ষিণ, তাওকিরা থেকে দক্ষিণের মরুভূমির বাল্‌ত আব্দেল হাফিতসহ যেসব উপজাতিদের অন্ততঃ একটি সন্তান মুখতার বাহিনীতে রয়েছে তাদের সবাইকে ১৯২৯ সাল নাগাদ কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে যেতে বাধ্য করা হয়।

কনসেনট্রেশন ক্যাম্পগুলোর অবস্থা ছিল ভয়ংকর। মুজাহিদিনদের সহযোগিতা করছে- এই সন্দেহে প্রায়ই শিবিরের নারী, শিশু ও পুরুষদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হতো। এছাড়া অনাহার ও রোগে মৃত্যু ছিল নিত্যদিনের ঘটনা।

১৯৩৩ সালে ইতালির সেনাবাহিনীর স্বাস্থ্য বিভাগের চেয়ারম্যান ডক্টর টৌডেস্কি তার সেরিনাইকা টুডে বইতে লিখেছেন, ১৯৩০ সালের মে মাস থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৮০ হাজার লিবীয়কে তাদের গ্রাম ছেড়ে আসতে এবং কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে

থাকতে বাধ্য করা হয়। ১৯৩০ সালের শেষ নাগাদ যেসব লিবীয় তাবুতে বাস করতো তাদের সবাইকে কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে যেতে বাধ্য করা হয়।

লিবিয়ার ইতিহাসবিদ মাহমুদ আলি আততায়েব ১৯৭৯ সালে এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, শিবিরগুলোতে থাকা ৫৫ শতাংশ লিবীয়র মৃত্যু হয়েছিল। ১৯৩০ সালের নভেম্বরে ক্ষুধা ও অসুস্থতায় প্রতিদিন ১৭ জন করে লিবীয় মারা যেত।

মুখতার বাহিনীর আক্রমণে বিপর্যস্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত ১৯২৪ সালে ইতালির গভর্নর আর্নেস্ট বমবেলি জেবেল আখদারের পার্বত্য অঞ্চলে পাল্টা গেরিলা বাহিনী গঠন করেন। ইতালির এই নতুন বাহিনীর পাল্টা আক্রমণের মুখে মুখতার দ্রুত তার যুদ্ধকৌশল পাল্টান। এসময় তিনি মিশর থেকেও কিছুটা সামরিক সাহায্য পেতে সমর্থ হন।

১৯২৭ সালের মার্চে ইতালীয়রা জাঘবুব দখল করে। ১৯২৭ থেকে ১৯২৮ সাল পর্যন্ত মুখতার সানুসি বাহিনীকে পুনর্গঠিত করেন। ১৯২৯ সালে পিয়েত্রো বাদোগলি লিবিয়ার গভর্নর হিসেবে নিয়োগ পান। তিনি ওমর মুখতারের সাথে শান্তি আলোচনায় বসেন। এসময় গভর্নরের পক্ষ থেকে মুখতারকে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করতে বলা হয়। শেষ পর্যন্ত এই আলোচনা ব্যর্থ হয় এবং ওই বছরের অক্টোবরে মুখতার লিবিয়ায় ইতালির সেনাপ্রধান রডোলফো গ্রাজিয়ানির সাথে চূড়ান্ত যুদ্ধের জন্য লিবিয় যোদ্ধাদের সংগঠিত করেন।

১৯৩০ সালের জুনে গ্রাজিয়ানির বাহিনী মুখতারের কাছে পরাজিত হয়। খবর পেয়ে ইতালির প্রধানমন্ত্রী মুসোলিনি ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। মুখতার বাহিনীর প্রতিরোধ ভেঙ্গে দিতে গ্রাজিয়ানির পরামর্শে মুসোলিনি জেবেল আখদার থেকে কনসেনট্রেশন ক্যাম্প সরিয়ে উপকূল এলাকায় নিয়ে আসার নির্দেশ দেন। এছাড়া গিয়ারাবুবে উপকূলের কাছে লিবিয়া ও মিশরের সীমান্ত কাঁটাতার দিয়ে বন্ধ করে দেয়া হয়। মুখতারের যোদ্ধারা যাতে মিশর ও স্থানীয় জনতার সহযোগিতা না পায় সেজন্যই এ ব্যবস্থা নেয়া হয়।

১৯৩১ সালের প্রথম দিক থেকেই মুখতার বাহিনীর প্রতিরোধ ক্ষমতা ভেঙে দিতে সক্ষম হয় গ্রাজিয়ানির বাহিনী। আকাশ ও স্থল উভয় পথেই মুখতার বাহিনীর ওপর চলে আক্রমণ। এর পরেও মুখতার লড়াই চালিয়ে যান। ১৯৩১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর স্লোনটার কাছে অতর্কিত হামলা চালানো হয় মুখতার বাহিনীর ওপর।

ইতালির সেনাদের গুলিতে মুখতারের ঘোড়াটি মারা গেলে পড়ে যান তিনি। এরপরেও নিজের বন্দুকটি নেওয়ার চেষ্টা করলে সেনারা তার হাত লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে। শেষ পর্যন্ত আহত অবস্থায় ৭২ বছর বয়সে বন্দি হন মুখতার।

মাত্র তিনদিনের মধ্যে মুখতারের বিচার সম্পন্ন হয়। ১৪ সেপ্টেম্বর তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয় এবং প্রকাশ্যে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার আদেশ দেয় বেনগাজির সামরিক আদালত। ১৯৩১ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর সুলুকের কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে মুখতারকে ফাঁসিতে ঝোলানো হয়।

মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার আগে মুখতারকে মুক্ত করে দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। বিনিময়ে তাকে মুজাহিদদের কাছে চিঠি লিখে ইতালির বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করার নির্দেশ দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। জবাবে মুখতার বলেছিলেন, 'আমরা কখনোই আত্মসমর্পন করবো না। হয় আমরা জিতব নতুবা মৃত্যুকে বরণ করবো। তোমাদেরকে পরবর্তী প্রজন্মের সঙ্গে লড়তে হবে এবং এর পরের প্রজন্মের সঙ্গে।'

(collected)

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৬৩৫১

# সুলতান_সালাহুদ্দিন_আইয়্যুবী রহঃ-এর ইন্তেকাল

maruful

Junior Member

১২-০৭-২০১৭

পূর্বে প্রকাশের পর...

পর্ব -২

কাযি সাহেব এটাই ভাল মনে করলেন যে, আমরা ফিরে যাই আর কালাসার ইমাম- শায়খ আবূ জা'ফরকে রাতে দূর্গে অবস্থান করার জন্য ডেকে আনা হোক। কেননা, ইমাম সাহেব খুবই ভাল মানুষ ছিলেন। আল্লাহ না করুন, রাতে সুলতান মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লে তিনি নারীদেরক সরিয়ে (মুমূর্ষু সুলতানকে) কালিমায়ে শাহাদাত তালকিন ও আল্লাহর যিকির করাতে পারবেন। তিনি তাই করলেন। আমরা দূর্গ থেকে নেমে এলাম। আমরা প্রত্যেকইই কামনা করছিলাম, যদি সুলতানের জীবনের বিনিময়ে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করা যেত। সে রাতটি সুলতান মৃত্যুপথের যাত্রীর ন্যায় কাটালেন। শায়েখ জা'ফর তার কাছে কুরআন তেলাওয়াত করছিলেন এবং তাঁকে আল্লাহর যিকিরের তালকিন করছিলেন। নবম রাত থেকেই তিনি অচেতন ছিলেন। মাঝেমধ্যে চৈতন্য ফিরে পেতেন। শায়েখ জা'ফর বলেছেন, (তিলাওয়াত করতে করতে) যখন তিনি

**هوا الله الذي لا اله الا هو، عالم الغيب والشهادة**

পর্যন্ত এসে পৌঁছলেন তখন মুমূর্ষু সুলতান বলে উঠলেন, 'সহীহ'। এটা ছিল প্রয়োজনের মূহুর্তে চৈতন্য এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে সুলতানের বিরাট সাহায্য। সুতরাং সকল প্রশংসা আল্লাহর। বুধবার বাদ ফজর ২৭ সফর ৫৮৯ হিজরী সুলতান ইন্তেকাল করলেন। ফজরোদয়ের পরই ইন্তিকালের মূহুর্তে কাযি ফাযেল ছুটে এসেছেন। আমি পৌঁছতে পৌঁছতে সুলতানের ইন্তেকাল হয়ে গেছে-তিনি

রওনা করেছেন আল্লাহর সন্তুষ্টির পানে, তাঁর করুণার আশ্রয়ে এবং তাঁর পরম প্রতিদানের উদ্দেশ্যে। আমাকে বলা হয়েছে যে শায়েখ জা'ফর যখন এই আয়াতে পৌঁছলেন **[لا اله الا هو عليه توكلت ]** তখনি সুলতান মুচকি হাসেন, তাঁর চেহারা আনন্দোদ্ভাসিত হয়, নিজেকে তিনি সঁপে দিলেন আপন প্রতিপালকের সমীপে। এ ছিল এমন কঠিন এক দিন, খোলাফায়ে রাশেদাকে হারানোর পর ইসলাম ও মুসলমান আর কখনো এমন দিনের সম্মুখীন হয়নি। দূর্গ-প্রাসাদ থেকে থেকে শুরু করে সারা দেশে; বরং সমগ্র পৃথিবীতে এমন বিষন্নতা ছেয়ে গেল, মহান আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না। আল্লাহর কসম, আমি কিছু মানুষকে দেখেছি, তারা নিজেদের জীবনের বিনিময়ে সুলতানের 'মৃত্যু-মুক্তি' কামনা করছে।

ইতোপূর্বে আমি এ-ধরণের কথা শুধু 'কথার কথা' হিসাবেই শুনে এসেছি, কিন্তু সেদিন আমার নিজের ক্ষেত্রে এবং অন্যদের ক্ষেত্রে বুঝতে পেরেছিলাম যে, সত্যিই যদি 'মুক্তিপণ' গ্রহণের সুযোগ থাকত তাহলে সুলতানের জন্য যে কেউ প্রাণ উৎসর্গ করত। সুলতানপুত্র মালিক আফযাল উত্তর দিকের বৈঠকখানায় সান্ত্বনার জন্য বসলেন। দূর্গের ফটক শুধু আমির-ওমারা ও বিশিষ্টজনের জন্য উন্মুক্ত রাখা হল। এ ছিল এক ভয়াবহ দিন। প্রত্যেককে তার দুঃখ-কষ্ট, কান্না ও হা-হোতাশ অন্যের বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা থেকে ব্যতিব্যস্ত করে রেখেছিল। কোনো কবির কবিতা আবৃতি অথবা কোন বক্তা ও বিশিষ্টজনের জন্য কথা বলা থেকে মজলিসকে (সেদিন) সংরক্ষিত রাখা হয়েছিল। সুলতানের সন্তানসন্ততি একটু সান্ত্বনার তালাশে সবার কাছে ছুটে যাচ্ছিল। তাদের এই করুণ দৃশ্য দেখে বুক ফেটে যাওয়ার উপক্রম হচ্ছিল। যোহরের পর পর্যন্ত এই অবস্থাই অবস্থা অব্যাহত থাকল। এরপর সুলতানের গোসল ও কাফনের কাজ শুরু হল। তাঁর কাফনের ইন্তেযামের ক্ষেত্রে এক আনা মূল্যের বস্তুও করয ছাড়া ব্যবস্থা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হল না; এমনকি মাটিভেজা ঘাসের মূল্যটুকুও। ফকীও দাউলায়ি সুলতানকে গোসল করালেন। গোসলদানে শরিক হওয়ার উদ্দেশ্যে উঠে গেলাম, কিন্তু সে দৃশ্য বরদাশত করার মতো শক্তি আমার হল না। যোহর নামাযের পর তোয়ালে পেঁচানো একটি কফিনে সুলতানের জানাযা বের করে আনা হল। এই তোয়ালে এবং কাফনের অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাপড় এনেছিলেন কাযি ফাযেল। কীভাবে ব্যবস্থা করেছিলেন তিনিই জানেন। সুলতানের খাটিয়া দেখে চিৎকার শুরু হয়ে গেল, কান্নার রোল পড়ে গেল, যা মানুষকে জানাযার নামায থেকে বিরত রাখল।

(পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার পর) লোকেরা দলে দলে তার জানাযা পড়ল। প্রথমবার যিনি ইমামতি করেছিলান তিনি হলেন কাযি মুহিউদ্দিন ইবনে যাকি। এরপর তাঁকে বাগানবাড়িতে নিয়ে আসা হল। এখানেই তিনি অসুস্থতার দিনগুলো কাটিয়েছিলেন। বাগানের পশ্চিম পাশে 'ছায়াঘেরা' একটি স্থানে তাকে দাফন করা হল। তাকে কবরে নামানো হল আসরের কাছাকাছি সময়ে। আল্লাহ তাঁর আত্মাকে পবিত্র করুন এবং তাঁর কবরকে নূর দ্বারা পরিপূর্ণ করুন। দিনের শেষভাগে সুলতানপুত্র মালিক যাফির মানুষকে সান্ত্বনা দিলেন এবং তাদের হৃদয়কে শান'ত করার চেষ্টা করলেন। সুলতানের শোক মানুষকে লুটপাট ও বিশৃঙ্খলা থেকে বিরত রেখেছিল। প্রতিটি হৃদয় ছিল ব্যথিত। প্রতিটি চক্ষু ছিল অশ্রুসিক্ত। আল্লাহ যাদেরকে ইচ্ছা করেছেন শুধু তারা ব্যতিক্রম ছিল। এরপর মানুষ নিজনিজ ঘরে ফিরে গেল বীভৎসতম ফিরে যাওয়া। সে রাতে আমরা (কয়েকজন) ছাড়া আর কেউ প্রাসাদে ফিরে এল না। প্রাসাদে এসে আমরা কুরআন পড়লাম এবং বেদনার অবস্থাকে নবায়ন করলাম।

মালিক আফযাল পুরোটা সময় সেদিন থাকলেন তার চাচা ও ভাইদেরকে এই ঘটনার দুঃসংবাদ জানিয়ে পত্র লেখার কাজে। দ্বিতীয় দিন (প্রজাদের) সান্ত্বনার উদ্দেশ্যে সাধারণ বৈঠক করলেন এবং ফকীহ ও আলীমদের জন্য দূর্গের ফটক উন্মুক্ত রাখলেন। আলোচকরা আলোচনা করছিলেন। তবে কোন কবিই কবিতা আবৃত্তি করেনি। যোহরের সময় মজলিশ ভাঙল। সকাল-সন্ধ্যা মানুষের আগমন, কুরআন তিলাওয়াত এবং সুলতানের মাগফিরাত কামনা অব্যাহত থাকল। সুলতান আফযাল শাসনকার্য পরিচালনা এবং ভাই ও চাচাদের কাছে চিঠি পাঠানোর কাজে আত্মনিয়োজিত থাকলেন।

তাই কবির ভাসায়

**ثم انقضت تلك السنون و اهلها**

**فكأنها وكأنهم أحلام.**

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৮৩৭০

# আল কায়েদা ভারতীয় উপমহাদেশের আমির মাওলানা আসেম ওমর (হাফি.)এর সংক্ষিপ্ত জীবনি

Galib Ibn Adam

Junior Member

০৬-২০-২০১৭

মুখচোরা ছেলেটার স্বভাব ছিল বইয়ের মধ্যে মুখ গুজে থাকা। ভালো ছেলে বলেই এলাকায় সমাদৃত ছিল দিল্লি শহরের ২০০ কিলোমিটার দক্ষিণের দীপা সরাই গ্রামের স্বাধীনতা সংগ্রামীর উত্তরসূরি পরিবারের ছেলে সানাউল হক। ছেলের মাদ্রাসায় পড়াশোনা করার ইচ্ছাকেও অমর্যাদা দেয়নি পরিবারের গুরুজনেরা। সব কিছু ঠিকঠাকই চলছিল। কিন্তু, তাল কাটল মক্কায় যাওয়ার জন্য ছেলের এক লক্ষ টাকা চাওয়ায়। নাছোড় সানাউলকে সামলাতে গায়ে হাত তুলেছিলেন তার কাকা। তারপর ১৯৯৫ সালে নিখোঁজ হয়ে যায় দীপা সরাই গ্রামের স্বাধীনতা সংগ্রামীর পরিবারের ছেলে সানাউল। দু'দশক পরে সেই ছেলের আল-কায়েদা যোগ নিয়ে মাথায় হাত উঠেছে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বাহিনীর।

সানাউল আল-কায়েদার সাধারণ সদস্য নয়। খোদ ওসামা বিন লাদেনের উত্তরসূরি আল-কায়েদা প্রধান জাওয়াহিরির ডান হাত এই সানাউল। যদিও এখন নাম বদলে মাওলানা আসিম উমর হয়েছে সানাউল। সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশে সংগঠনের ভার রয়েছে এই আসিম উমরের কাঁধে। বছর পঁচাত্তরের সানাউলের বাবা ইরফান-উল-হক বলেছেন, "২০০৯ সালে পুলিশের থেকে জানতে পারি আমার ছেলে সন্ত্রাসবাদী সংগঠনে নাম লিখিয়েছে। তারপর সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়ে ছেলেকে ত্যাজ্য ঘোষণা করেছিলাম।" সন্ত্রাসবাদী সংগঠন মানে যে আল-কায়েদা তা জেনে হতভম্ব পুলিশের সঙ্গে পরিবার। সানাউলের সত্তরোর্ধ্ব মা জানিয়েছেন, পুলিশ না জানালে জানতেই পারতাম না যে সানাউল বেঁচে আছে। [পত্রিকা থেকে সংগ্রহিত, যাচাই বাচাই করা সম্ভব হয় নি ]

**শিক্ষাগত যোগ্যতা :**

#দারুল_উলুম_দেওবন্দ
#জামিয়া_উলুম_ইসলামিয়া_পাকিস্থান
#দারুল_উলুম_হক্কানীয়া
মাওলানা আসেন ওমর ভারত ত্যাগ করার আগে দারুল উলুম দেওবন্দের ছাত্র ছিলেন। ভারত ত্যাগের পর মাওলানা আসেম ওমর লেখাপড়া করেন জামিয়াতুল উলুম আল ইসলামিয়া করাচি, (জিহাদের জন্য নাম করা মাদ্রাসা) মুফতি নিজাম উদ্দিন সামজাই ছিলেন ঐ মাদ্রাসার মুহতামিম। তিনি আফগানিস্থানের তালেবান শাসকে সমর্থন করতেন। তাছারা তিনি পাকিস্থানের জিহাদি দল যেমন হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামি, হরকাতুল মুজাহিদীন, জইস ই মহাম্মদ এর মতো দলের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

সামযাই জিহাদ ঘোষনা করেছিলেন আমেরিকা এবং তার মিত্রদের বিপক্ষে। ২০০১ সালে যখন আমেরিকা সন্ত্রাস নির্মুলের জন্য আফগানিস্থানের উপর হামলা করে এবং তালেবান ও আল কায়েদার বিপক্ষে যুদ্ধ করে তখন তিনি এই ফতুয়া দিয়েছিলেন। ২০০৪ সালে তিনি তার নিজ মাদ্রাসায় ইন্তেকাল করেন। মুফতি নিজাম উদ্দিন সামজাই রহ: দুইজন বিশিষ্ট ছাত্র হলেন কারী সাইফুল্লাহ আকতার ও ফাজলুর রহমান খলিল। যারা পরবর্তিতে হরকাতুল জিহাদ ই ইসলামি গঠন করেন ১৯৮৩ সালে। ১৯৮৭ সালে ফজলুর রহমান খলিল বিভক্ত হয়ে হরকাতুল মুজাহিদীন গঠন করেন। ১৯৯৮ সালে হরকাতুল মুজাহিদীন ওসামা বিন লাদেনের সাথে যুক্ত হয়।

তাছাড়া মাসউদ আযহারও মুফতি নিজাম উদ্দিন সামযাই রহ: এর ছাত্র। মাওলানা আসেম ওমর হাফি: আরো লেখাপড়া করেছেন দারুল উলুম হক্কানীয়া মাদ্রাসায়। দারুল উলুম হক্কানীয়া মাদ্রাসাকে বলা হয় জিহাদিদের ফ্যাক্টরি। কারন আমিরুল মুমিনীন মোল্লা মোহাম্মদ ওমর রহ: এর মতো তালেবানরা অধিকাংশই এই মাদ্রায়ার ছাত্র।

যখন রাশিয়া আফগানিস্থানে প্রভাববিস্তার করে তখন দারুল উলুম হক্কানীয়ার মুহতামিম ছিলেন মাওলানা সামিউল হক।এবং তিনি রাশিয়ার বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদ ঘোষনা করেন তখন তার মাদ্রাসার ছাত্র সংখ্যা ছিলো ১০ হাজার।

*কর্মক্ষেত্র:*

#হরকাতুল_জিহাদ_আল_ইসলামিয়া

#হরকাতুল_মুজাহিদীন

#আল_কায়েদা_ভারতীয়_উপমহাদেশ

২০১৪ সালে শাইখ আইমান আল যাওয়াহীরি হাফি: মাওলানা আসিম ওমর হাফি: কে ভারতীয় উপমাহাদেশের আমির হিসেবে ঘোষনা করেন..

এখন পর্যন্ত তিনি এই দায়িত্বে রয়েছেন।

(হে আল্লাহ)" মুক্ত আমি নিঃস্ব আমি দেবার কিছু নাই

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৭১৯২